বিদ্রোহী ‘সপ্তকন্যা’

পাহাড় আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ভারতের এই সাত রাজ্য। ভারত সর্বশক্তি দিয়েও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বিদ্রোহ। এই সাত রাজ্যের নানাবিধ দিক নিয়ে লিখেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক **ড. আবদুল লতিফ মাসুম**

‘বাড়ির পাশে আরশীনগর, সেথায় এক পড়শী বশত করে, আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।’ লোককবি লালনের এ খেদ যথার্থ। আমাদের বাড়ির পাশে ‘সপ্তকন্যা’, বিরাজ করে। নিষিদ্ধ প্রতিবেশীর মতো এদের সবকিছুই যেন আমাদের অজানা। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ঘিরে যে বিশাল জনাঞ্চল সেই প্রাঙ্গণের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমস্যা সম্ভাবনা, আন্দোলন-সংগ্রাম কোনো কিছুই যেন আমাদের স্পর্শ করে না। অথচ অর্ধশতাব্দী আগে ওদের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল আমাদের জীবন। ওদের কৃষি শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি সবকিছুই ছিল ভাটির দেশ বালাদেশের মানুষের ওপর নির্ভরশীল। অবশেষে একদিন ভাগাভাগি হলো সংসার। মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সময় কয়েকটি জানালা খোলা হলেও তা ছিল আপাতত। রাজনীতির ব্যাকরণে বাঁধা পড়েছে চিরায়ত সম্পর্ক। তবুও মানুষ এপাশ-ওপাশ করে। জানতে চায় একে অপরকে। আর এ জানার সতত আগ্রহ থেকেই আজকের নিবেদন।

নকশিকাঁথার মাঠ

‘সপ্তকন্যা’- ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সমষ্টি এ নামেই পরিচিত। এ অঞ্চলের রূপবৈচিত্র্য, রহস্যময়তা আর সম্পদ সুষমা নরের চেয়ে নারীর বৈশিষ্ট্যই বেশি বহন করে। সুতরাং নামকরণ সার্থক। সম্ভবত বিশাল ভারতের সবচেয়ে সম্পদসম্পৃক্ত এবং সবচেয়ে সমস্যাসঙ্কুল অংশ এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল। অতীতে মূলত আসাম নামেই যার ছিল পরিচয়, আজ তা সপ্তখন্ডে বিভক্ত। এই বিভক্ত ‘সপ্তকন্যা’ হচ্ছে-১. আসাম ২. মেঘালয় ৩. মিজোরাম ৪. মনিপুর ৫. নাগাল্যান্ড ৬. ত্রিপুরা ৭. অরুণাচল

সপ্তকন্যার বিষয় বৈচিত্র্য বিমোহিত করেছে মানুষকে। একজন পন্ডিত সপ্তকন্যাকে অভিহিত করেছেন ভারতের ‘নকশিকাঁথার মাঠ’ বলে (পিসি মাথুর : ১৯৮৩:১৪) আবার কেউ বলেছেন ‘এ এক রঙধনু’ (বিজি ভার্গেস : ১৯৯৬:১)। বিস্ময়করভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ এ অঞ্চল। পৃথিবীর মানুষের কাছে আজও এক দূরবর্তী মানচিত্র। আর ভারত কর্তৃত্বের কাছে দূরবর্তী সীমান্ত। তাও আবার অশান্ত উত্তাল উত্তেজনাকর এবং সহিংসতাপূর্ণ। ভারত বিভাগের পর এই অঞ্চল কখনও ভারতের হৃদয়ভূমিতে এবং ক্ষমতার পাদ প্রদীপে জায়গা করে নিতে পারেনি। আদি বাংলার মানুষজন যেমন অভিজাত আর্যদের কাছে ছিল ‘বন্য জাতীয় প্রাণী’, তেমনি আধুনিক ভারতের স্থপতিদের কাছে এ অঞ্চলের মানুষেরা যেন ‘বন্য জাতীয় প্রাণী’। অগম্য বনভূমি, গগনবিদারী পর্বতমালা আর বৃষ্টির ব্যাপকতা সমুদ্রের মতো বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এ অঞ্চলকে। আধুনিক ভারত থেকে ‘উন্নয়ন এবং উদারতা’ উভয় দিক থেকেই পিছিয়ে রয়েছে এরা।

রূপকথার দেশ

অবশ্য দিল্লি থেকে সবসময়ই পিছিয়ে ছিল এই জনগোষ্ঠী। ব্রিটিশ যুগের আগে ‘শক হুন মোগল পাঠান এক দেহে লীন’ হলেও এদের একীভূত করা সম্ভব হয়নি। মোগল বাহিনী বারবার চেষ্টা করেও ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করতে পারেনি। ফলে আমাদের এই ‘বাঙ্গালমুলুকে’ কামরুল কামাখ্যা’ (আধুনিক আসাম) রূপকথার দেশ ছিল অতীতে। ১৮২৬ সালে ব্রিটিশরা যখন আসাম থেকে বার্মিজদেরকে বিতাড়ণ করে তখন থেকেই সূচনা হয় আধুনিকায়নের। অবারিত হয় বাঙালিদের জন্য আসামের অবরুদ্ধ দুয়ার। তখন থেকে ব্রিটিশ বিজিত এ অঞ্চল স্থলপথে ভারত উপনিবেশ আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়-সিঙ্গাপুর ঔপনিবেশিক অঞ্চলের সেতুবন্ধনের কাজ করে আসছিল। এ অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার। ব্রিটিশ রাজত্ব পর্যন্ত এ অবস্থা বহমান থাকে। ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর রাজনৈতিক দেয়াল বাধা হলেও অর্থলিপ্সুরা সে দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করেছে বারবার। তাই মদ-মাদকদ্রব্যসহ নিষিদ্ধ পণ্যের পারাপার ঘটে এ পথে। এ পথেই রয়েছে সেই বিখ্যাত ‘বার্মিজ ট্রাঙ্গল’। তাই অতীতের সিল্করুটের মতো ভারত-বাংলাদেশমুখী এ নেশার রুট স্বার্থসংশ্লিষ্টদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছে। এ অঞ্চলের অস্থিরতার অন্যতম কারণ যে এটাই, গবেষকরা তা স্বীকার করছেন। (এসএল শর্মা : ১৯৮৩)

রণকৌশলগত অবস্থান

এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক কৌশলগত সুবিধার চেয়ে হাজারো গুণ বেশি এর রাজনৈতিক গুরুত্ব। বিশেষত ভারতের জন্য এ অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর এলাকা। (লে. সে. ভি. কে, নায়ার : ২০০০ : ১০৪) রণকৌশলবিদরা এর নানা কারণ আবিষ্কার করেছেন।

প্রথমত : এ অঞ্চলেই মহাচীনের সঙ্গে রয়েছে ভারতের সীমান্ত সংলগ্নতা। অরুণাচল প্রদেশের সুদীর্ঘ বিরোধপূর্ণ সীমান্ত রয়েছে। এখানেই সেই বিখ্যাত ম্যাকমোহন লাইন। ১৯৬২ সালে যা ছিল চীন-ভারত যুদ্ধের কারণ। বিষয় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বর্তমান একক বিশ্বব্যবস্থায় ভারত ক্রমবর্ধমান মার্কিন সম্পৃক্ততা এ অঞ্চলের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে পাক-আফগান পরিস্থিতির কারণে ভারতকে এ অঞ্চলের প্রতিবেশী মনোযোগী হতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত : বিপুল সম্পদ সম্পৃক্ত এ অঞ্চল। কয়লা, খনিজ তেল, লৌহ এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল মজুদ রয়েছে এখানে। সমগ্র ভারতের উত্তম বনাঞ্চল এটি।

তৃতীয়ত : চীন, নেপাল, বার্মা, বাংলাদেশ এবং ভুটানের অবস্থান এ এলাকা ঘিরে। এতগুলো রাষ্ট্রের সঙ্গমস্থল হওয়ার কারণে কাশ্মীরের মতো এ অঞ্চলও ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক সমীকরণ সব সময় অনুকূল না থাকার কারণে বিদ্রোহ উপদ্রুত এ অঞ্চলে ভারতের কয়েক ডিভিশন সেনা মোতায়েন রয়েছে।

চতুর্থত : এ অঞ্চল একেবারেই ভূমিবদ্ধ। ভারত ভাগের পূর্বে এ এলাকার আমদানি-রপ্তানি পরিচালিত হতো বাংলাদেশের চট্টগ্রাম নদীবন্দর দিয়ে। দেশ বিভাগের পরে সমুদ্র সমীপতা হারিয়ে এ অঞ্চলকে হাজার মাইল অতিক্রম করে কলকাতা নদীবন্দরকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিকল্পিত হয় এ অভিযোগ ভারত-বাংলাদেশ উভয় পক্ষের। সুতরাং উভয় দেশের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এ অঞ্চলকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে।

পঞ্চমত: এ অঞ্চলের প্রবেশপথ ভারতের জন্য সব সময়ই নাজুক এবং বিপজ্জনক। ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটারের একটি মরুপথ দিয়ে ভারতকে বিদ্রোহ এবং বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ এ অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হচ্ছে। এটাই সেই বিখ্যাত শিলিগুড়ি করিডর। যাকে রণকৌশলবিদরা 'চিকেননেক' বা মুরগির গলা বলে উপহাস করে থাকেন। এ করিডরের ৯৯% আন্তর্জাতিক সীমান্তের অন্তর্গত। বাংলাদেশে যদি কোনো অবন্ধুসুলভ সরকার বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, তাহলে এ গলিপথটি হয়ে উঠতে পারে ভারতের জন্য 'মৃত্যু ফাঁদ'।

ষষ্ঠত : 'সপ্তকন্যার' প্রতিটি রাজ্যেই ভারতবিরোধী অথবা

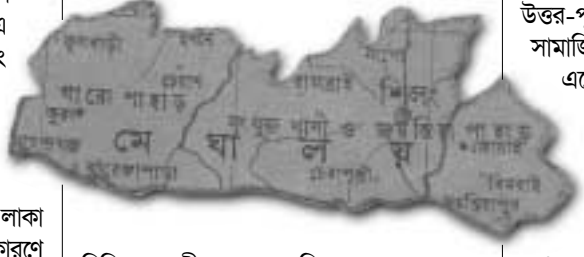

বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গেরিলা গ্রুপ রয়েছে। ভারত বরাবরই এসব গ্রুপের প্রতি সমর্থনের জন্য চীন, বার্মা এবং বাংলাদেশকে দোষারোপ করে আসছে। বাস্তবতা এই যে, প্রাকৃতিক কারণে বার্মা বিদ্রোহীদের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভয়াশ্রম হয়ে পড়েছে।

সপ্তমত : এই অঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চল এবং নদীবিধৌত বনভূমি অঞ্চল উভয় অংশই দুর্গম। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে অরণ্য এবং জলমগ্নতা বিদ্রোহীদের প্রতি অনুকূল ভূমিকা রাখছে।

আসল নকল পরিচয়

ভারতের এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ভারতের মূল জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা। নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, এ অঞ্চলের জনস্রোতের হাজার বছরের ভাটা-জোয়ার সত্ত্বেও ভারতীয় জাতি কাঠামোতে এরা নবীন। (কে.এম. সিং : ১৯৯২) এখানে বসবাসরত অধিকাংশ জনগণ বহিরাগত। এরা দু' ধরনের। ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে এসে বসতিস্থাপনকারী। অপরপক্ষে চীনের তিব্বত দখলের পর আসা লোকজন। বার্মার তাড়া খেয়ে আসা উপজাতিসমূহ। সর্বোপরি অতীতে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা থেকে সেখানে বসতিস্থাপনকারী বাঙালি জনগোষ্ঠী। আদি বনাম বহিরাগত সমস্যা এখানে প্রবল। প্রতিটি রাজ্যে বাঙালি খেদাও অভিযান বিশেষত মুসলমান বাঙালি খেদাও মনোভাব মারাত্মক। এ নিয়ে প্রায়শই দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এ অঞ্চলের ঐসব বিশেষত্ব দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভারতের ৫৬৫৩টি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ৬৩৫টি হচ্ছে উপজাতি বা পাহাড়ি জনগোষ্ঠী। বিস্ময়ের বিষয়, পাহাড়িদের ২০০টি সম্প্রদায় বাস করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এসব রাজ্যে। এদের মধ্যেও আবার উপসম্প্রদায় বা উপবিভাগ রয়েছে। কিছু রয়েছে সমতলভূমির উপজাতি। আবার অনেকে পাহাড়ি। সুতরাং সব মিলে সপ্তকন্যার একটি সুন্দর সাবলীল স্থিরচিত্র নির্ণয় করা সম্ভব নয়। গোত্রের আধিক্যের সঙ্গে ভাষারও ব্যাপক বিভাজন রয়েছে। ভারতের আর কোথাও এত ভাষা বৈচিত্র্য নেই। ১৯৯৩ সালে পরিচালিত একটি ভারতীয় সরকারি তথ্য মোতাবেক ৩২৫টি কার্যত ভাষার ১৭৫টিই হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'সপ্তকন্যায়'। এখানকার সামাজিক বৈচিত্র্যও উল্লেখ করার মতো। একেকটি গোত্র একেকটি উপজাতি একেক ধরনের বিবাহ, পরিবার প্রথা ও অন্যান্য বিধিনিষেধ অনুসরণ করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেমন খাসিয়া, রভাস, তিয়াস এবং হাজং সম্প্রদায় নারী শাসিত। অন্যরা আবার পুরুষ শাসিত। কৃষি ব্যবস্থা অনেক অঞ্চলেই সেই ঐতিহ্যবাহী 'জুম' পদ্ধতির। তবে কোনো কোনো অঞ্চল এবং উপজাতি যেমন আনগামী পাগা এবং আপাতানিরা আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। এ অঞ্চলে চা ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হয়। অসংখ্য চা বাগান রয়েছে এখানে। চা বাগানগুলোকে কেন্দ্র করে নতুন এক পেশাজীবী জনশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে- এরা 'চা গোত্র' নামে পরিচিত হচ্ছে। তবে আশ্বস্ত হওয়ার ব্যাপার এই যে, এরা শ্রীলঙ্কার চা সম্প্রদায় : তামিলদের মতো 'আমদানিকৃত জনগোষ্ঠী' নয়। চা বাগানে কর্মরত জনগোষ্ঠী অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে রেখেছে। এ হিসেবে দেখা যায় যে, সমতলভূমির আসামে সবচেয়ে অসমতল জনগোষ্ঠী 'চা গোত্র' গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশরাই এ ধরনের চা গোত্রের উদ্যোক্তা।

ডিভাইড এন্ড রুল

ব্রিটিশরা এখানেও তাদের সেই চিরাচরিত 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি চালু করে। যারা তাদের কাছাকাছি আসে তাদেরকে নানাবিধ সুবিধা দেয়, যা শ্রমে নিয়োগ করে। যারা একেবারেই দূরে থাকতে চায় তাদেরকে তারা সেভাবেই থাকতে দেয়। গোটা সীমান্তবর্তী এ অঞ্চলকে তারা প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চল, পরোক্ষ শাসিত অঞ্চল অথবা দেশীয় রাজ্যের মতো মর্যাদা দিয়ে খুশি রাখে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী নানা ধরনের বিধিবিধান প্রয়োগ করে 'সপ্তকন্যার দেশকে একরকম সপ্তশতে' ভাগ করা হয়। এত বিভাজন সত্ত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাদের জন্য ঐক্যের পথ করে দেয়। এই অঞ্চলে জাপানের দখলদারিত্ব শতধা বিভক্ত এসব জাতিগোত্রসমূহকে স্বাধীনতার হাতছানি দেয়। এসব গোত্র তথা উপজাতিসমূহ নতুন আত্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং গোত্র বা প্রজাতিগত ঐক্যে উদ্বুদ্ধ হয়। ভারতের মূল ভূখন্ডে যখন ঐ সময় স্বাধীনতা আন্দোলন সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হয়, তারাও 'তাদের মতো করে' স্বাধীনতার জন্য উচ্চকিত হয়। ভারতের জাতীয় নেতারা তাদেরকে যখন এক এবং অভিন্ন হওয়ার কথা বলেন তখন নৃতত্ত্ব, গোত্রগত বিভেদ, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ভাষা, ধর্ম এবং পৃথক জীবন পদ্ধতির প্রশ্নে স্বাভাবিক বিভাজন রেখা তৈরি করে। এভাবেই সৃষ্টি হয় আজকের কথিত 'তাহারা' এবং 'আমরার' ভিন্ন পরিচয়। তাদের ভিন্ন পরিচয় দিল্লিশ্বরদের কাছে পাকিস্তানিদের মতোই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। এভাবে ভারতের 'সপ্তকন্যা' 'স্বাধীনকরণ' এবং ভারতীয়করণের দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বে নিপতিত হয়।'

আধুনিকায়নের ছোঁয়া

যোগাযোগের ক্ষেত্রে এসব রাজ্যসমূহ সেই আদিকালেই পড়ে আছে। বিশেষত ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মনিপুরের রাস্তাঘাটের অবস্থা এতটাই বেহাল যে আবহাওয়া খারাপ থাকলে অথবা রাজনৈতিক সহিংসতা ঘটলে আর অগ্রসর হওয়ার উপায় থাকে না। অবাক হওয়ার মতো ঘটনা ১৯৫৩ সালের আগে অরুণাচলের লোকেরা গাড়ি দেখেনি। শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সবকিছুতে এরা পশ্চাৎপদ। অবশ্য সামগ্রিকভাবে যে অবস্থার উন্নতি হয়নি এমন নয়। প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থা বিলিয়মান, বিনিময় প্রথা রহিত হয়েছে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ হচ্ছে। গ্রাম মাতবর যাকে তারা বলে 'গাওন বুড়া'র পরিবর্তে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুব নেতৃত্বের বিকাশ হচ্ছে।

এতদসত্ত্বেও বৃহত্তর সাধারণ মানুষ তাদের সেই উপজাতি ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি দ্বারা শাসিত। ভারতীয়করণের উপকরণ : হিন্দুত্ব, হিন্দি এসব অঞ্চলে আরোপিত বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত উদার সহিষ্ণু এবং পার্থিব খ্রিস্টধর্ম তাদের কাছে বেশি মঙ্গলজনক মনে হয়েছে। বলতে গেলে এ অঞ্চলে খ্রিস্টধর্মের প্রসার অভাবনীয়। নাগা, মিজু, মনিপুরি এবং খাসিয়ারা গত একশ' বছর ধরে বিপুল সংখ্যায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। কাশ্মীর যেমন ভারতের একমাত্র মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশ তেমনি নাগাল্যান্ড ভারতের খ্রিস্টানপ্রধান রাজ্য।

খ্রিস্টধর্মের প্রভাব

এ অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম এসেছে আধুনিকতার বাহন হিসেবে। মিশনারী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীরব বিপ্লব হচ্ছে স্থানীয় উপজাতিগুলোর নিজস্ব ভাষার অনুপস্থিতির কারণে ল্যাটিন হরফ গ্রহণ। ফলে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এ সব নব্য খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে। সাম্প্রতিক সময়ে এসব অঞ্চলে শিক্ষার হার বেড়ে গেছে। এখানকার অধিকাংশ রাজ্য মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম এবং অরুণাচল ইংরেজিকে তাদের রাজ্য ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইংরেজি বা খ্রিস্টধর্মের প্রসারের অর্থ অবশ্য এই নয় যে, সেখানে আধুনিকায়ন বা ভারতীয় জাতীয়করণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বরং নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতিতে ফিরে যাবার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠতাও তৈরি করছে। নিজেদের স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন ত্রিপুরার কোক-বারক, মেঘালয়ের মেঙ-খাসী এবং মিজোরামে মেইটিমদের মধ্যে 'আদিতে ফিরে যাবার প্রেরণা' প্রবল হচ্ছে। আন্দোলন হচ্ছে। জাতিসংঘ বা অন্যান্য এনজিওদের কার্যক্রম তাদের ঐ নীতি অবস্থানের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এসব মিলে ভারতের এ

এ সপ্তাহের বিশ্ব

মার্কিন প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি

মার্কিন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ডকম ইনকরপোরেটেডের বিরুদ্ধে আদালতে দুর্নীতির মামলা করেছে ২৫টি ব্যাংক। ২৫০ কোটি ডলার ঋণ জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে। তবে প্রতিষ্ঠানটির ২৬৫ কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ জব্দ করার অনুরোধ আদালত প্রত্যাখ্যান করেছে। এদিকে সিনেটে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিসাব জালিয়াতির জন্য ১০ বছরের কারাদন্ডের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

ফরাসি প্রেসিডেন্টের প্রাণনাশের চেষ্টা

জাতীয় দিবসের প্যারেড অনুষ্ঠানে ফরাসি প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাককে গুলি করে হত্যার প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে। বাস্তিল পতন দিবস উপলক্ষে এদিন প্রেসিডেন্ট শিরাক সশস্ত্র বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছিলেন। এ সময় জনতার মাঝে দাঁড়ানো এক সশস্ত্র তরুণ গুলি চালানোর চেষ্টা করলে প্রথমে জনতা ও পরে পুলিশ তাকে আটক করে। ধারণা করা হচ্ছে, আততায়ী উগ্র ডানপন্থি কোনো দলের সদস্য। অবশ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত উগ্র ডান নেতা জঁ মারি লপেন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

জম্মু স্টেট মোর্চা গঠন

কট্টরপন্থি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) নেতৃত্বে ১৯টির বেশি রাজনৈতিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে জম্মু স্টেট মোর্চা। পৃথক জম্মু প্রদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরএসএস-এর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী কুমারকে প্রধান করে এই মোর্চা গঠিত হলো। এদিকে দু'বছর আগে অনন্তনাগ জেলায় ৩৭ জন শিখ হত্যার অভিযোগে পুলিশ যে ৫ জন মুসলমানকে হত্যা করেছিল, ডিএনএ পরীক্ষার পর পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে তারা সবাই নিরপরাধ ছিল।

শেখ ওমরের ফাঁসির আদেশ

মার্কিন সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে হত্যার অভিযোগে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত শেখ ওমরকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের একটি বিশেষ সন্ত্রাস দমন আদালত এই রায় দিয়েছে। শেখ ওমরের অপর তিন সহযোগীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক পার্লকে করাচি থেকে অপহরণের পর হত্যা করা হয়। পরে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পার্লের লাশ শনাক্ত করা হয়। এদিকে ওমরের আইনজীবীরা জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করতেই এ রায় দেয়া হয়েছে।

অঞ্চলে এমন এক নতুন সত্তা ও সংস্কৃতির বিকাশ হচ্ছে যা ভারতের অপরাপর অঞ্চলের প্রেক্ষিতে 'একক' বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। ভারতের অন্যসব অঞ্চলের উপজাতি এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে সংযোগ সংযোজন এবং সহমিলন ঘটলেও ভারতের এ অঞ্চল তার স্বকীয়তার কারণে বরাবর 'যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই' রয়ে গেছে। বর্তমান অবস্থায় অন্তত জাতিসত্তার প্রেক্ষিতে কথাটি ধ্রুব সত্য। অবশ্য এর কারণও রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর ভারত থেকে স্বাধীনতা না পেলেও স্বকীয়তা রক্ষার জন্য বিধিবিধান তথা স্বায়ত্তশাসন অর্জন করে এসব জনগোষ্ঠী। ১৯৫০-৫৩ সালে তাদের জাতি ও সম্প্রদায়গত অবস্থানের স্বীকৃতিস্বরূপ এক আসাম ঘিরে সপ্তকন্যার জন্ম হয়। এসব পদক্ষেপ ম্রিয়মাণ জাতি পরিচয়কে সজীব রেখেছে।

বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা

ভারতের অন্য উপজাতিদের তুলনায় এরা অধিকতর বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ নেতিবাচক ফল দিচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যে স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন, সংগ্রাম, সহিংসতা ঘটছে। ইংরেজি, খ্রিস্টান ধর্ম, শিল্পের ক্রমবর্ধমান হার, ভারতের অধিকতর কনসেশন তাদেরকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে গড়ে তুলছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি এসব রাজ্যসমূহে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ যুদ্ধবিগ্রহ না থাকতো তাহলে এদ্দিনে ভারতের প্রভুত্বের অবসান হওয়া সম্ভব ছিল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আছে কিন্তু বহিরাগতদের ব্যাপারে 'সব শিয়ালের এক রা'। দিল্লিশ্বর বহিরাগত প্রধানত বাঙালিদেরকে তাদের অস্তিত্বের অংশীদার মনে করছে। আর উপজাতিসমূহ বাঙালিদেরকে তাদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি মনে করছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, বাঙালিরা তাদের ওপর খবরদারি করছে না। ১৮২৬ সাল থেকে ব্রিটিশরা প্রশাসন পরিচালনার জন্য বাঙালিদের নিয়োগ করে। সব বাঙালি ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বসতি গড়ে। পার্শ্ববর্তী বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় জমির স্বল্পতা থাকায় তারা আসামে অবারিত জমির আশায় আসাম গমন করে। প্রচুর সংখ্যক বাঙালি শ্রমিকও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ নেয়। বাঙালিদের অধিকতর প্রতিষ্ঠায় শঙ্কিত হয় আসামের আদি অধিবাসী অহমিয়ারা। সেই কবে থেকে যে বিরোধের শুরু আজও তা ক্রিয়াশীল। অহমীয়রা বাঙালি খেদাও অভিযান পরিচালনা করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহিংসতা ঘটছে।

পৃথক পৃথক জাতিসত্তার স্বীকৃতি এবং তাদের নিজস্ব শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের জন্য বৃহত্তর আসাম ভেঙে ৭টি রাজ্যের সৃষ্টি হলেও তা বিদ্বেষ ও বিভাজন সম্পূর্ণ দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই বৃহত্তর রাজ্য সৃষ্টির পাশাপাশি আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির আদলে রয়েছে বেশ কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য বা এলাকা। এ ধরনের রাজ্য বা এলাকাসমূহ কেন্দ্র শাসিত। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকভাবে কেন্দ্রের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। অপরদিকে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব, প্রশিক্ষিত জনশক্তিহীনতা, পুঁজির স্বল্পতা, উদ্যোক্তার অভাব, বিপণন সংকট, আমদানি-রপ্তানি অসুবিধা ইত্যাদি কারণে কাম্য সুফল অর্জিত হচ্ছে না। অধিবাসীদের অভিযোগ তাদের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। শুধু তাই নয়, পান বিদ্যুৎ উৎপাদনে তাদের ব্যাপক সুবিধা অন্য রাজ্যের উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া তেল, গ্যাস, কয়লা, লিমোস্টোন ইত্যাদি খনিজ পদার্থের দেদার লুটপাট চলছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের মাটির মানুষেরা অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। জমি এবং বনাঞ্চলের ওপর উপজাতিগুলো যে গতানুগতিক জোর অধিকার রাখে, এখন তাদের সেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অতীতের উপজাতি সংরক্ষিত এলাকাগুলো ক্রমহ্রাসমান হারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চা এবং রাবারের উৎপাদন ববং শিল্পায়ন ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে।

বিভেদের মাঝে ঐক্য

ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এ ধরনের জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তারা 'বিভেদের মাঝে ঐক্য' সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ষোড়শ অনুচ্ছেদে এ ধরনের প্রজাতি বা উপজাতিসমূহের রক্ষাকবচ রয়েছে। আসলে তা বাস্তবে কার্যকর নয়। ভারতীয় জাতীয় নেতারা ভালো ভালো কথা বললেও উত্তরাধিকার

সাদ্দামের ভাষণ

ইরাক বিপ্লবের ৩৪তম বার্ষিকীতে টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে সাদ্দাম হোসেন যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদের যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, 'শয়তানরা' তাকে উৎখাত করতে পারবে না। ১৯৬৮ সালের ১৭ জুলাই এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাথ পার্টি ইরাকের ক্ষমতায় আসে। ১১ বছর পর সাদ্দাম প্রেসিডেন্ট হন। এদিকে ৭০ জন নির্বাসিত ইরাকি সামরিক কর্মকর্তা সাদ্দামকে উৎখাতের পরিকল্পনা করতে লন্ডনে এক বৈঠক করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র এতে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

মাদক পাচারের অভিযোগ

একজন সৌদি প্রিন্সের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিমানে করে মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগ উঠেছে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নন এমন একজন প্রিন্স কূটনৈতিক সুবিধা ব্যবহার করে ভেনিজুয়েলা থেকে ৯৮০ কেজি কোকেন প্যারিসে এনেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। মার্কিন আদালতে আনা অভিযোগে আরও তিনজন সহযোগীকে দায়ী করা হয়েছে।

মোদীর পদত্যাগ

গুজরাটের বহুল সমালোচিত মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পদত্যাগ করেছেন। রাজ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগঠিত সম্প্রাদায়িক দাঙ্গায় তার ভূমিকার জন্য তিনি বিতর্কিত হন। মোদীর জন্য কেন্দ্রে বিজেপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এবং সরকার চাপের মুখে পড়ে। তবে মোদীকে বরখাস্তের দাবি বিজেপি কখনও মানেনি। এদিকে মোদী নতুন নির্বাচন দাবি করেছেন।

খুনি ডাক্তার আটক

ব্রিটেনের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ সিরিয়াল কিলার ডাক্তার হ্যারল্ড শিপম্যানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। প্রকাশিত তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, হ্যারল্ড ইচ্ছাকৃতভাবে ২১৫ জন রোগীকে হত্যা করেছে। যাদের অধিকাংশই বয়সে বৃদ্ধ। এর আগে শিপম্যান ১৫টি হত্যা মামলার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলো।

ইসরাইলের সমালোচনা

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান ফিলিস্তিনি বোমা হামলাকারীদের আত্মীয়স্বজনদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতনে ইসরাইলি নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। এর আগে ইসরাইলের অভ্যন্তরে দুটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৩ জন ইসরাইলি নিহত হয়। এর পরপরই ইসরাইলি বাহিনী সন্দেহভাজন হামলাকারীদের পরিবার-পরিজনকে আটক করে এবং বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয়। ইসরাইল এদের নির্বাসনে পাঠানোর হুমকি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও এজন্য ইসরাইলের সমালোচনা করেছে।

হাসান মূর্তাজা

সম্পত্তির মতো ব্রিটিশ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে কোনো ছাড় দিতে তারা নারাজ। যেমন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু নাগাদের সম্পর্কে ভালো কথা বললেও তাদের 'চিরায়ত স্বাধিকার'-এর প্রতি ছিলেন বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতোই খড়্গহস্ত।

অন্তর্ঘাতী তৎপরতা

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই সশস্ত্র তৎপরতা এই অঞ্চলকে তছনছ করে দেয়। বিগত ৫৫ বছর ধরে নানা উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, আপস-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালিত হয়ে আসছে। সে এক বিরাট অধ্যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলে এক নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিগত ৩৩ বছরে নানা সরকারের আমলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের উষ্ণতা তিক্ততা অনুভূত হয়েছে। এই অনুভবের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ ঐ অঞ্চলে শান্তি ও সংগ্রাম প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই সময়ে মোট ৬টি প্রধান ইমারজেন্সি গ্রুপ বা অন্তর্ঘাত দল 'সপ্তকন্যায়' সক্রিয় রয়েছে। তারা হলো-

১. নাগাল্যান্ড-মিজোরাম : ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (এনএসসিএন) কর্মরত।

নাগা অন্তর্ঘাত হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো বিদ্রোহ। বলা হয়, সবচেয়ে বড় বিরোধ। পঞ্চাশের দশকে শুরু যার আজও শেষ হয়নি তা। ইতিমধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে নাগা নেতৃত্ব। আইজাক মুভিরা আর খাপ লং দু অংশের নেতা। রাজনৈতিক সমীকরণেও বিপরীত মেরুর লোক এরা।

২. আসাম : এক সময়ের সমৃদ্ধ আসাম এখন অন্তর্ঘাতে ক্ষতবিক্ষত। সেখানে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট ফর আসাম (উলফা) হচ্ছে প্রধান শক্তি। অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (এএএসইউ) সহায়ক শক্তি। এছাড়া রয়েছে ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট (ইউএসএফ)-এর মতো ছোটখাটো সংগঠন।

৩. বদো : বদো আসামের একটি প্রাচীন শক্তিশালী ইদানীং বাইংস একটি উপজাতি। বদোরা কয়েকটি সশস্ত্র দলে বিভক্ত। ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বদোল্যান্ড (এনডিএফবি) প্রধান সংগঠন। অল বদো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আবসু) তাদের সহায়ক শক্তি।

৪. মনিপুর : নাগা বোদ্ধারা মনিপুরে সক্রিয়। মনিপুরে যথেষ্ট সংখ্যক নাগা রয়েছে। সেখানকার আরও আদিবাসী হিসেবে দাবিকৃত মেইতি উপজাতি তাদের প্রাধান্যের জন্য লড়ছে। মেইতিরা ঐতিহ্যবাহী। তারা তাদের হারানো সাম্রাজ্য, হৃতগৌরব এবং ক্ষয়িষ্ণু মেইতি ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্য লড়ছে। মনিপুরের দ্বন্দ্বটা যতটা না 'স্বাধীনতার জন্য' তারচেয়ে বেশি স্বজাতিদের বিরুদ্ধে।

৫. ত্রিপুরা : ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলানটিয়ার্স (টিএনভি) ত্রিপুরার আদিবাসীদের জন্য সংগ্রামরত। ১৯৪৭ সালে যেখানে আদিবাসীদের হার ছিল ৯৩% আজ তা দাঁড়িয়েছে ২৮.৫%-এ। এদের সশস্ত্র সংগ্রাম এই অব্যাহত নিপীড়নের বিরুদ্ধে। এছাড়াও ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এনএলএফটি) ও সক্রিয় গেরিলা সংগঠন।

৬. মেঘালয় : মেঘালয়ে সক্রিয় সশস্ত্র গ্রুপের নাম হাইনইউট্রেন এ ছিক লিবারেশন কাউন্সিল (Hyunine A chik libaration Council)। এরা একটি বামপন্থি বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ। ইতিপূর্বে সক্রিয় 'আলমা' গ্রুপের অবশিষ্টাংশ বলে এরা পরিচিত। রাজ্যের জন্য এরা কোনো বড় সমস্যা নয়। তুলনামূলকভাবে মেঘালয় শান্ত।

৭. অরুণাচল : বিরল জনবসতিপূর্ণ অরুণাচলের সমস্যা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক। সেখানে অরুণাচলের আদিবাসী আর চাকমাদের বিরোধ তীব্র। অল অরুণাচল প্রদেশ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এএপিএসইউ) 'চাকমা খেদাও' বক্তব্য নিয়ে উত্তেজনা ছড়াবার চেষ্টা করছে। উভয় পক্ষের বিরোধে উত্তপ্ত অরুণাচলের মাটি। ইউনাইটেড লিবারেশন আর্মি অব অরুণাচল (ইউএলএএ) এবং ইউনাইটেড পিপলস ভলান্টিয়ার্স অব অরুণাচল (ইউপিভিএ)-এর মতো সন্ত্রাসী সংগঠন জন্মলাভ করেছে সম্প্রদায়গত বিরোধের কারণে।

উপসংহার

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এই 'সপ্তকন্যা' এই প্রেক্ষিতে বিবেচিত হচ্ছে কেন্দ্র (Core) যার পরিধি (Periphery) সম্পর্কের ভিত্তিতে। (এসি শিনহা : ১৯৯৪)। কেন্দ্র বিবেচনা করা হয় ভারতের উত্তর এবং মধ্যাঞ্চলের 'হিন্দু এবং হিন্দি' প্রভাব বলয়ের নিরিখে। ভারতের পশ্চিম এবং দক্ষিণ অংশ 'হার্টল্যান্ড' না হলেও কেন্দ্রানুগ। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চল হিন্দুও নয় আর হিন্দি ভাষাভাষীও নয়। সুতরাং তার এই পেরিফেরি বা প্রান্তসীমায় অবস্থান অবধারিত। ভারতের জাতীয় সংহতির ধারক-বাহকরা বলছেন, আঞ্চলিক, সংকীর্ণ। প্রান্তিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষিক বিভেদ ভুলে যেতে হবে। তাদের এ বক্তব্য ভারত অনুসৃত চিরায়ত বিরোধের মাঝে ঐক্যনীতির বিরোধী। তাদের এ বক্তব্য সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বিপরীত। ভারতীয় ঐক্যের একজন বড় সমঝদার (মেনাম পারামপিল : ১৯৯৪) বলেন যে, ভারতের একজন দোভাষীর চেয়েও বেশি প্রয়োজন সংস্কৃতি কর্মীর, যে বর্ণাঢ্য ভারতকে একীভূত করবে। এদের পরামর্শ, সংযোগের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমন্বয়। ১৯৪৭ থেকে ২০০২ পর্যন্ত সমন্বয়ের চেষ্টা হয়নি তা নয়। অসংখ্য 'দেশ ছোট বুফ' (সুবীর ভৌমিক : ১৯৯৬) যেমন অসংখ্য চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। অবশেষে 'সপ্তকন্যা'কে নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বহির্ভূত 'নিউ ফেডারেলইজম' বা নতুন উপযুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দেয়ার জন্য উত্তর-পূর্ব পরিষদ বা নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলও (এনইসি) গঠিত হয়েছে। দিল্লি বলছে, এর মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়ন ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। 'সপ্তকন্যা' আগলে রাখার এ ফর্মুলার পর তারা এটাকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেছে। সিকিমকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। উপ-আঞ্চলিক জোটের দুর্বোধ্য নামে বাংলাদেশকে এ মকরধজ গলাধকরানোর চেষ্টা হয়েছে। বর্তমান 'প্রযুক্তি বিপ্লব' আর বিশ্বায়নের যুগে রাজনৈতিক অধীনতার চেয়েও সপ্তকন্যার জন্য যা জরুরি তা হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তি। এ ঈপ্সিত লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সংস্কার, উদারনীতি এবং সমঝোতার মনোভাব 'সপ্তকন্যা'র ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। আর বাংলাদেশ তখন বলবে- 'হাত বাড়ালেই বন্ধু'।